দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

63

ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা

বিলকিস নাহার স্মৃতি

বিশ্বের যে কোন আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাত্র তথা শিক্ষিত তরুণরা। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ যেকোন আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাকে তীব্র করে তোলে। তৃতীয় বিশ্বের যেকোন বৃহৎ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা।

বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত সীমিত, তাই শিক্ষিত সচেতন ছাত্ররাই সকল সফল আন্দোলনের মূল চলিকাশক্তি। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তি-যুদ্ধ, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে এদেশের ছাত্রদের অবদান মুখ্য-এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। রাজনীতি-সচেতন ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ উপস্থিতি সকল আন্দোলনের গতিকে অধিক বেগবান করেছে। সততা, দেশপ্রেম, নিরলস কাজ করার ক্ষমতা এদেশের ছাত্রদের মূলমন্ত্র। রাজনীতিতে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে দিক-নির্দেশনা দিত। প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতি চর্চা করতো বলেই এসব সম্ভব ছিল। বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক তৎপরতা ছাত্র সংগঠনগুলোর ভাবমূর্তি প্রকাশ করতো সাধারণ ছাত্রদের মাঝে। সাধারণ ছাত্ররাও স্বইচ্ছায় সচেতনভাবে পছন্দমত সংগঠনে যোগ দিত। আর তাই সংগঠনগুলোর মধ্যে নীতি-আদর্শের চর্চা ছিল, ছিল যোগ্যতা প্রমাণের প্রতিযোগিতা, কর্মঠ- মেধাবী ছেলেদের সমাহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হতো বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে। আর এর ফলেই এমন সব বৃহৎ সার্থক আন্দোলন সম্ভব ছিল।

আজকের দিনে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ভিন্ন রূপ। বর্তমানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ দেখলে হতাশ হতে হয়। বিস্মৃত হতে হয় অতীতের গৌরবময় ভূমিকার কথা। এখন মেধাবী ছেলেরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে রাজনীতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, যদিও বা বোর্ড কেউ করে তা নামে মাত্র। এর কারণ হলো ছাত্র সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী তৎপরতা, পেশী-শক্তির চর্চা, নীতি-আদর্শহীনতা, কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতি। বৃহৎ ছাত্র সংগঠনগুলোতে পেশীশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র নামে অছাত্রদের সমাহার লক্ষণীয়, যারা নীতি-আদর্শের চেয়ে ক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অধিক পারদর্শী। অতীতে যেমন, কোন সংগঠনে কত মেধাবী, কর্মঠ ছাত্র আছে তার প্রতিযোগিতা হতো, বর্তমানে বৃহৎ সংগঠনগুলোতে কতবেশি অস্ত্রধারী (যাদেরকে তাদের ভাষায় 'আর্মসক্যাডার' বলা হয়) আছে তার প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্র রাজনীতির মূল চেহারাটাই গেছে পাল্টে। তার সাথে পাল্টেছে নেতা-কর্মীদের চেহারা ও কাজের ধারা। বর্তমানে সদস্য সংগ্রহের পদ্ধতিটিও ভিন্ন। বৃহৎ ছাত্র সংগঠনগুলো যে কায়দায় সদস্য সংগ্রহ করে তা হচ্ছে একেকটি সংগঠন পেশীশক্তির বলে কয়েকটি করে হল দখল করে আছে। সাধারণ ছাত্ররা যে সংগঠনের অধিকৃত হলে থাকবে তাকে সেই সংগঠনের সদস্য হতে হবে, নয়তো তার পক্ষে হলে থাকা সম্ভব নয়। এটাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সদস্য সংগ্রহের স্থায়ী পদ্ধতি। আসন স্বল্পতা ও ব্যক্তিগত নানা অসুবিধার কারণে এ অবস্থা মেনে নিয়েই সাধারণ ছাত্ররা হলে থাকে এবং রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়। এ অবস্থার বিরুদ্ধে কেউই কখনো কোন প্রতিবাদ করে না। এক্ষেত্রে ছোট বাম সংগঠনগুলোও কোন পদক্ষেপ নেয় না। এভাবেই পেশীশক্তির কাছে দিনে দিনে বন্দী হয়ে গেছে আমাদের গৌরবের ছাত্র-রাজনীতি, শুধুমাত্র পেশীশক্তি বৃদ্ধি ও ক্ষমতা প্রদর্শনই বৃহৎ সংগঠনগুলোর বর্তমান কাজ। এর ব্যতিক্রম সংগঠনগুলোর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ যা তেমন আলোড়িত করে না।

গত কিছুদিন আগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো এবং ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। সারা দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের একটা অংশই মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা করে। চিকিৎসার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মের জন্য তৈরি হতেই মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা করে। আর এজন্য দরকার সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু বর্তমান ছাত্র রাজনীতির কালো প্রভাব এখানেও সমান পরিলক্ষিত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্য সংগ্রহের পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন। তাদের ভাষায় সদস্য সংগ্রহকে বলা হয় 'মুরগী ধরা'।

আর প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে না হতেই সদ্য কৈশোর পেরুনো ছাত্রদের পড়তে হয় এই 'মুরগী ধরা' ফাঁদে। এর কবল থেকে অভিভাবকরাও রেহাই পান না। পদ্ধতিটা হলো- ভর্তির সময় একজন ছাত্রকে এক সংগঠনের চার-পাঁচ জন মিলে ঘিরে ধরে। অতিমাত্রায় বিনয়ী চেহারা করে খোঁজ-খবর নেয়, আলাপ জমায়, এক পর্যায়ে অত্যন্ত উলঙ্গভাবে নিজের সংগঠনের কথা বলতে শুরু করে। উলঙ্গভাবে বলা যায় এই জন্য যে, তারা কোন নীতি-আদর্শের কথা বলে না। কোন্ সংগঠন করলে সুযোগ সুবিধা কত বেশি, কাদের পেশীশক্তি কত বেশি এবং কোন্ সংগঠন করলে হলে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে সে কথাই বলে। এখানেই কেবল শেষ না, ঠিকানা ফোন নম্বর রেখে দিয়ে বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করে। এতে করে অভিভাবকরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ছাত্ররাতো বটেই। কোন কোন ছাত্র হলে উঠার ভয়ে এখানে সেখানে উদ্বাস্তুর মতো জীবন যাপন করে। কেউ কেউ প্রলোভনে পড়ে রাজনীতির সাথে সরাসরি

পৃঃ ১০ কঃ ৫

ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সিম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তারপর একদিন হয়ত কোন এক পেশীশক্তি প্রদর্শনের মহড়ায় অকালে প্রাণ হারায়। এভাবেই আমাদের ছাত্র রাজনীতি একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই আলোচনা থেকে বর্তমান ছাত্র রাজনীতির অবস্থা অনুধাবন করা যায়। আর এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের ক্ষমতালোভী স্বার্থপর নেতা-নেত্রীরা। যে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলো কাজ করে সে দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সযত্নে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেশ থেকেও সরিয়ে রাখেন। আর দেশপ্রেম, গণতন্ত্র-এসব মুখভরা আদর্শের বুলি বলে নিজেদের ব্যক্তিগত সাফল্যের পথ সুগম করার জন্য অস্ত্র তুলে দেন তরুণদের তথা ছাত্রদের হাতে। যেসব প্রাণ টগবগে তরুণরা নেত্রীদের নামে শ্লোগান দিয়ে আকাশ কাঁপায়, তারাই ধমক দিয়ে ডাইনিং-এ খায়, কমান্ডো কায়দায় হল দখল করে, চাঁদাবাজি করে, কেউ কেউ লাশ হয়ে যায় হঠাৎ একদিন। যাদের কুমন্ত্রে ছাত্র রাজনীতির এই ন্যক্কারজনক অবস্থা তাদের ক্ষমতা লাভের পথ আরো প্রশস্ত হয়। এভাবেই তারা পৌঁছে যান ক্ষমতার চরম শিখরে। আজকে তাই এই অবস্থা থেকে, অসুস্থ রাজনীতির প্রভাব থেকে ছাত্র রাজনীতিকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। একমাত্র ছাত্ররা সচেতন হলেই আমরা আবার আমাদের রাজনীতিকে স্বার্থের কালো প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারবো সুস্থ স্বাভাবিক ধারায়। ফিরে পাবো আমাদের গৌরবের সময়-গুলো। এ সত্য অনুধাবন করা এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর এর জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে ছাত্রদেরকেই। *

(লেখিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)